বণিক বার্তা বৃহস্পতিবার, আগস্ট ২৮, ২০২৫

NORTH SOUTH UNIVERSITY LIBRARY ★ 1992 ★

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থেকে দূরে রাখতে হবে

সাক্ষাৎকার

অধ্যাপক আবদুল হান্নান চৌধুরী
উপাচার্য, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি (এনএসইউ)

চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা অর্থাৎ কর্মসংস্থানের সংকটকে কেন্দ্র করে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের বছর পেরিয়ে গেল। অভ্যুত্থান-পরবর্তী এ খাতে যে প্রত্যাশা ছিল তার কতটুকু পূরণ হয়েছে?

বাংলাদেশে চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা এবং কর্মসংস্থানের সংকটকে কেন্দ্র করে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান কেবল একটি প্রতিবাদ নয়, বরং দীর্ঘদিনের সঞ্চিত বঞ্চনা, হতাশা ও অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে তরুণ সমাজের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। এ দেশের তরুণরা সব সময়ই প্রমাণ করেছে তারা পরিবর্তনের অগ্রদূত। তারা চায় নিজেদের যোগ্যতা ও মেধার সঠিক মূল্যায়ন। যেখানে ন্যায্য সুযোগের মাধ্যমে পরিশ্রম এবং দক্ষতাই হবে সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে তাই শিক্ষা ও কর্মসংস্থানকে কেন্দ্র করে মৌলিক পরিবর্তনের প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল। শিক্ষার্থীরা ভেবেছিল, সরকার ও নীতিনির্ধারকরা হয়তো এবার শিক্ষা খাতে বাস্তবভিত্তিক পরিবর্তন আনবে। কর্মসংস্থানের নতুন দ্বার উন্মোচন হবে।

দুঃখজনকভাবে সেই প্রত্যাশা পুরোপুরি পূরণ হয়নি। কিছু পরিবর্তন এলেও সমস্যার মূলে যে কাঠামোগত অসামঞ্জস্য, সেখানে বড় কোনো পরিবর্তন আসেনি। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল দুর্বলতা হলো, এখানে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধির সুযোগ সীমিত। উদ্যোক্তা তৈরির কার্যকর কোনো পরিকল্পনা নেই। বরং শিক্ষার্থীরা একটি পরীক্ষাভিত্তিক প্রতিযোগিতার মধ্যে বন্দি হয়ে পড়ে। এর ফলে তারা চাকরিপ্রার্থী হিসেবে প্রস্তুত হলেও বাস্তব জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পিছিয়ে পড়ে।

অন্যদিকে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও সমস্যার গভীরতা স্পষ্ট। দেশে শিল্পায়নের গতি সেই মাত্রায় পৌঁছেনি, যাতে তরুণদের ব্যাপক কর্মসংস্থান হতে পারে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান পরিবর্তনের সুযোগ এনে দিয়েছিল। তরুণ ছাত্র-জনতা ও নীতিনির্ধারকদের মধ্যে সংযোগের নতুন দরজা খুলেছিল। কিন্তু সেটা যথাযথভাবে প্রস্ফুটিত হয়নি। ফলে আজও অনেক তরুণ মনে করছে, তাদের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা অনেকটা ধরাছোঁয়ার বাইরে। এ অবস্থার যদি অবসান না হয় তাহলে সমস্যা আরো প্রকট হবে।

দেশের বিভিন্ন খাতের সংস্কারে কমিশন গঠন করা হয়েছে। তবে শিক্ষা খাতের সংস্কারে কোনো কমিশন গঠন হয়নি। বিষয়টি কীভাবে দেখছেন?

শিক্ষা খাত একটি জাতির অগ্রগতির মূল ভিত্তি। এ খাতে কমিশন হওয়া প্রয়োজন ছিল। শিক্ষার ওপর নির্ভর করে কর্মসংস্থান, অর্থনীতি, সামাজিক কাঠামো এমনকি গণতান্ত্রিক চেতনার ভিত্তি। এক্ষেত্রে আমরা মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) ও বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের মতো প্রতিষ্ঠানের অগ্রণী ভূমিকা প্রত্যাশা করি। তবে এটা ঠিক, শিক্ষা খাতের সংস্কার দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। এ খাতে তাড়াহুড়ো করে সংস্কার কার্যক্রম এগিয়ে নেয়া দুরূহ। এজন্য স্বাধীন ও শক্তিশালী কমিশন গঠন করতে হবে।

এ কমিশনের কাজ হবে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরকে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করা। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সমস্যা চিহ্নিত করা। ঘাটতির আলোকে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা হাতে নেয়া। এ খাতে সংকট দূর করতে হলে পাঠ্যক্রম হালনাগাদ, শিক্ষকদের মানোন্নয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন, গবেষণায় বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার প্রসারে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

শিক্ষাকে স্বাধীনতা দিতে হবে, বাক্সবন্দি করে রাখলে চলবে না। এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, শিক্ষা খাতে এখনো মৌলিক পরিবর্তন কম। অথচ এ খাতের বড়সড় পরিবর্তন ছাড়া টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব না।

শিক্ষা খাত সংস্কারে কী কী করা যেতে পারে?

শিক্ষা সংস্কারের জন্য পাঠ্যক্রমকে যুগোপযোগী করে তোলা প্রয়োজন। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকাংশে পরীক্ষাভিত্তিক এবং মুখস্থবিদ্যার ওপর নির্ভরশীল। এতে শিক্ষার্থীরা তথ্য মুখস্থ করলেও নতুন কিছু সৃষ্টির মানসিকতা অর্জন করে না। অথচ আমাদের দরকার সৃজনশীল, উদ্ভাবনী ও বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্ম। আমরা চাই শিক্ষার্থীদের জন্য এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা, যেখানে তাদের দক্ষতা ও আগ্রহকে প্রাধান্য দেয়া হবে। দলগতভাবে কাজ শিখবে। সমস্যা সমাধানের অভ্যাস গড়ে তুলবে।

প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষার সংস্কার হতে হবে। বৈশ্বিক শিক্ষার সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে। আধুনিক ও মানসম্মত শিক্ষার পাশাপাশি ছোটবেলা থেকেই শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার উদ্যোগ নিতে হবে।

শিক্ষকদের মানোন্নয়নে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা গেলে শিক্ষা ক্ষেত্রে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এছাড়া উচ্চশিক্ষায় গবেষণা সম্পৃক্ততা ও আন্তর্জাতিক মানের একাডেমিক চর্চা বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে গবেষণায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। কারণ একটি জাতি গবেষণা ছাড়া এগোতে পারে না। গবেষণা নতুন জ্ঞান তৈরি করে, উদ্ভাবন ঘটায় এবং অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে।

এছাড়া শিক্ষা খাত হতে হবে মুক্ত-স্বাধীন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা থেকে দূরে রাখতে হবে। এজন্য মানসিক পরিবর্তন খুবই জরুরি। কিন্তু আমাদের দৈন্য সম্ভবত এখানেই বেশি। মুক্তভাবে চিন্তা করার সীমাবদ্ধতা শিক্ষা খাতকে একটা জায়গায় আটকে রেখেছে। শহর ও গ্রামের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুযোগের বৈষম্য দূর করতে হবে। স্কুল-কলেজ থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা সবার জন্য সমান সুযোগ থাকতে হবে। বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিতের মতো বিষয়ে গুরুত্বের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ দক্ষতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি কীভাবে আজকের এ পর্যায়ে এসেছে, কোন কোন দিক থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয় অন্যদের থেকে আলাদা?

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির আজকের এ পর্যায়ে আসার প্রধান কারণ হলো—এখানে শিক্ষাকে পাঠ্যসূচি কিংবা ক্লাসরুমে বেঁধে রাখা হয়নি। শিক্ষার্থীদের জন্য এক্সট্রা কারিকুলাম বা অতিরিক্ত-পাঠ্যক্রমিক এবং কো-কারিকুলাম বা সহপাঠ্যক্রমিক উভয়ই সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। এতে করে শিক্ষার্থীরা বাস্তবিক অনেক কিছু শিখতে পারে। এছাড়া এখানে আছে প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মান বজায় রাখা হয়। এখানকার শিক্ষকরা প্রতিনিয়ত আন্তর্জাতিক জার্নালে গবেষণা প্রকাশ

এরপর » পৃষ্ঠা ৪

করে, বৈশ্বিক গবেষণায় অংশ নেয়। এতে করে শিক্ষণ পদ্ধতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। পাঠদান ও অধ্যয়ন একটি গতিতে চলে।

এ বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক সহযোগিতার জন্য বিশ্বের অনেক শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অংশীদারত্ব গড়ে তুলেছে। এছাড়া আমাদের শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা শেষে শুধু দেশে নয়, বিদেশেও দক্ষতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারছে। এখানেই এনএসইউ অন্যদের থেকে আলাদা করেছে।

গত তিন দশকে দেশে শতাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। শিক্ষা খাতে এর অবদান কতটুকু? বিশেষ করে গবেষণা, উদ্ভাবন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তাদের ভূমিকা কেমন?

গত তিন দশকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেশের উচ্চশিক্ষার চিত্রকে আমূল বদলে দিয়েছে। ১৯৯০-এর দশকে যখন উচ্চশিক্ষায় আসনসংখ্যার ঘাটতি প্রকট হয়ে উঠেছিল, তখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যাত্রা শুরু করে।

বর্তমানে শতাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম চালাচ্ছে। যেখানে কয়েক লাখ তরুণ-তরুণী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে। এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা সংস্কার বলে আমি মনে করি। এর পরও দেশের জনসংখ্যার তুলনায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ অপ্রতুল।

তবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কোয়ালিটি কন্ট্রোল' প্রয়োজন। সব বিশ্ববিদ্যালয় সমানভাবে অবদান রাখছে তা বলা যাবে না। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে না পারলে সেসব প্রতিষ্ঠান অচিরেই হারিয়ে যাবে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিয়ে সবচেয়ে বড় বিতর্ক— বলা হয়, ধনিক শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়, কিন্তু কেন?

এ ধারণাটা ঠিক নয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বরং মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের বেশি দেখা যায়। পাশাপাশি মেধাবী কিন্তু আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীরাও এখানে স্কলারশিপ ও ফাইন্যান্সিয়াল এইডের মাধ্যমে পড়াশোনার সুযোগ পায়। সুতরাং সমাজের প্রায় সব শ্রেণী-পেশার মানুষের সন্তানদের অংশগ্রহণ এখানে আছে। তাই ঢালাওভাবে ধনিক শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় বলার সুযোগ নেই।

এছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালগুলো রাষ্ট্রীয় কোনো অনুদান পায় না। পরিচালন ব্যয়ের পাশাপাশি নতুন অবকাঠামো, গবেষণা ব্যয়—সব কিছুই নিজেদের অর্থায়নে করতে হয়। সেই দিক থেকে বিবেচনা করলে বরং রাষ্ট্রীয় অনুদান পাওয়া দেশের অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম সারির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান বেশ ভালো। যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো ভালো করার সুযোগ আছে।

দেশের প্রতিটি খাত কমবেশি সংস্কারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এ সময়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা সামগ্রিকভাবে শিক্ষা খাতে গুণগত মানের ক্ষেত্রে আপস করার সুযোগ নেই। টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষা খাতে দীর্ঘমেয়াদে সংস্কার কার্যক্রম হাতে নেয়া উচিত।